২

বাংলা সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্যচর্চা

বহুমাত্রিক চেতনায়

সম্পাদনা

তপন মন্ডল | দীপঙ্কর মল্লিক

রাকেশ জানা | অভি কোলে

বাংলা

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যচর্চা

বহুমাত্রিক চেতনায়

মেদিনীপুর সিটি কলেজ ও দি গৌরী কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত

সপ্তম আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে নির্বাচিত গবেষণা প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ

২

সম্পাদনায়

তপন মন্ডল • দীপঙ্কর মল্লিক

রাকেশ জানা • অভি কোলে

দিয়া পাবলিকেশন

৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

Bangla Samaj-Sanskriti-Sahityacharcha : Bahumatrik Chetanay

Vol. II

Edited by

Tapan Mandal ● Dipankar Mallik
Rakesh Jana ● Abhi Kole

Published by

Diya Publication
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com || diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/

Collaboration with

Midnapore city college
Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Pachim Medinipur
&
The Gouri Cultural & Educational Association
Social Welfare Organisation & Research Institution of
Society, Culture & Education
Registration No. S/IL/34421/2005-06 ● Established : 23.9.1995

ISBN : 978-93-87003-46-0

প্রথম প্রকাশ : ২.০৬.২০২৩

শোভন সংস্করণ : মূল্য ৫৫৫/-

সূ | চি | প | ত্র

উপন্যাস নিয়ে ■■■■■■■■■■■■■■ ১-১৭২

ফকিরমোহন সেনাপতি-র 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' : একটি সামাজিক সমীক্ষা
শ্রীতা মুখার্জী
১

'গোরা' উপন্যাসের ভারতীয় হিন্দুত্ববাদ
রমেশ সরেন
৭

রবীন্দ্র উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' : অন্তঃবাস্তবতা উন্মোচনে ভাষার নিপুণ প্রয়োগ
অভি কোলে
১৩

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মৃত্যুভাবনা
শুভাশিস দাস
২১

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাস : সংরূপ সন্ধানে
নম্রতা বিশ্বাস
২৮

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' : সমকালীন সমাজভাবনা
মনিকা মহাপাত্র
৩৪

ডাক্তার বনফুলের নির্বাচিত উপন্যাসে ডাক্তারি জীবিকার সংকট
রাকেশ জানা
৩৮

‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’-এ নিম্নবর্গের সমাজ-চেতনার পর্যালোচনা
প্রেমাঙ্কুর মিশ্র
৪৬

নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বনাম পুরুষতান্ত্রিকতা : প্রেক্ষিত ‘সুবর্ণলতা’
অস্মিতা মিত্র
৫৩

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ : আঞ্চলিক উপন্যাসের নিরিখে
রিয়ালী বসু
৫৮

বিমল করের ‘যদুবংশ’ : ষাটের দশকের অস্থির সময়ের আলোকে
সুতনু দাস
৬২

‘লালসালু’ : প্রসঙ্গ ধর্মীয় অন্ধ বেড়াজাল ও জীবনজীবিকা
চিত্ততোষ পৈড়া
৬৭

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস ‘অরণ্য আদিম’ : এক প্রাচীন জনজাতির ইতিবৃত্ত
প্রশান্ত কুম্ভকার
৭২

সমরেশ বসু ‘টানাপোড়েন’ উপন্যাসের পেশাগত সমাজভাষিক আলোচনা
যমুনা ধাড়া
৭৮

মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’ : মুণ্ডাদের সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্বেষণ
অরূপ সিং
৮৫

মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি
সুদীপা সাধু
৯১

‘গামহারডুংরী’ : সবুজায়নের এক বিপ্লবময় আখ্যান
কাকলি মোদক
৯৫

শোক থেকে শ্লোক : হাসান আজিজুল হকের 'আগুন পাখি'
অভি দাস
১০০

শৈবাল মিত্রের 'গোরা' ও চৈতন্যজীবনী'র গোরা
সৌমিলি দেবনাথ
১০৪

ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাসে লোকসংগীত ও জীবন
নবগোপাল সামন্ত
১০৯

ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' : লৌকিক বৃত্তিগত ভাষার পরিচয়
পিউ চক্রবর্তী
১১৪

অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়' : বাজিকরদের জীবনের উপাখ্যান
স্বপন রানা
১২২

অভিজিৎ সেনের 'রাজপাট ধর্মপাট' : প্রেমিক, মানবিক, সংবেদনশীল শ্রীচৈতন্য
দেবারতি মল্লিক
১২৬

অমর মিত্রের 'হাঁসপাহাড়ি' : প্রান্তিক মানুষদের জীবনচিত্র
সুখেন্দু ঘোষ
১৩২

নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' : উপন্যাসে লোকজ উপাদান অনুসন্ধান
রিঙ্কু দাস
১৩৭

নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসে জেলে কৈবর্ত সমাজ
শুভাশিস আচার্য
১৪৪

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস : জীবনবোধের দর্পণে
সত্যজিৎ সরকার
১৫১

নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত জীবন ও জীবিকা
মনিহার খাতুন
১৫৫

বাংলা উপন্যাসে বিশ শতকের চারের দশকে ভারত ও বঙ্গের রাজনীতি ও সমাজ
বাণী রায়
১৬৪

গল্প নিয়ে ১৭৩-২৭২

রবীন্দ্র-গল্পে নারীর ব্যক্তিসত্তার বিবর্তন
চন্দন বিশ্বাস
১৭৩

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে সমাজব্যবস্থা
পার্থজিৎ বেরা
১৭৮

বন্ধু ভূতের আখ্যান : প্রসঙ্গ 'সব ভুতুড়ে'র নির্বাচিত গল্প
মধুসূদন সাহা
১৮৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপায়' গল্পে আশা ও মল্লিকা : একটি তুলনামূলক পাঠ
সুধাংশু কান্তি মুড়িয়া
১৮৯

'দুঃশাসন' : এক কলঙ্কিত পুরাণকথার পুনরাবৃত্তি
সুব্রত চক্রবর্তী
১৯৫

চল্লিশের দশকের প্রেক্ষাপটে : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প
অরিত্র বাগ
২০৫

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্পে প্রেমধর্মের প্রকাশ
টিংকু কুমার ঘোড়াই
২১১

'আদাব' : মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাবোধের আখ্যান
বিপাশা বসাক
২১৭

ইকোক্রিটিসিজমের ভাবনায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গাছটা বলেছিল' গল্প
গনেশ কর্মকার
২২৩

দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে পারিবারিক মূল্যবোধের অবনমন
উজ্জ্বল মণ্ডল
২২৭

নবারুণ ভট্টাচার্যের গল্পে অবক্ষয়িত সময় ও সমাজের চিত্র : নির্বাচিত দুটি গল্প অবলম্বনে
মনিরা খাতুন
২৩৩

কায়েস আহমেদের গল্প : প্রসঙ্গ নকশাল আন্দোলন
তাপস পাল
২৪০

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পে জীবন-জীবিকায় প্রযুক্তির আগ্রাসন ও প্রভাব
বাপ্পী বর্মণ
২৪৬

অন্ন সংকট : 'নিম অন্নপূর্ণা', 'জাতুধান' ও 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'
সুস্মিতা ঘোষ
২৫২

সত্তরের ছোটোগল্পে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও ভাঙনের সংস্কৃতি
নবীনচন্দ্র দে
২৫৭

স্বরূপ ও বিবর্তন : নির্বাচিত গল্পের আলোকে
রবীন্দ্রনাথ মুদি
২৬৩

বাংলা অণুগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও বহুমাত্রিকতা
সুমন সরকার
২৬৮

রবীন্দ্র উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' : অন্তঃবাস্তবতা উন্মোচনে ভাষার নিপুণ প্রয়োগ

অভি কোলে

'গো 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাস প্রকাশের ছয় বছর পরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাস। এই ছয় বছর রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অন্তর্বর্তী কালপরিসরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে তিনটি ঘটনার বিশেষ প্রভাব পড়ে—

১. তাঁর পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ (১৯১২-১৯১৩)
২. তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি (১৯১৩, নভেম্বর)
৩. প্রথম বিশ্বসমর (১৯১৪-১৯১৮)

সবকিছু মিলিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পালাবদল দেখা দিল। গল্প-উপন্যাসে পালাবদল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান উক্তি উপন্যাসে নূতন রীতি-আলোচনার সূত্রপাতে অবশ্য স্মর্তব্য—

My Stories of a later Period have got the necessary technique... I have different strata of my life and all my writings can be divided into so many Periods. All of us have different incarnation in this very life. We are born again and again in this very life.[১]

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি রূপায়িত হয়েছে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। বাংলা তথা ভারতীয় উপন্যাসে 'চতুরঙ্গ' একটি সম্পূর্ণ মাত্রা যোজনা করল। উপন্যাস পাঠের সমস্ত পূর্ব-সংস্কার বিপর্যস্ত হয়ে গেল 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। বাস্তবতা থেকে উপন্যাস এখন অন্তঃবাস্তবতায় (inner reality) উন্নীত হল—

বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনে এই উপন্যাসের গুরুত্ব অসীম। প্রথম এখানেই পাঠক জেনেছে চরিত্রের বিবর্তন বলতে বোঝায় তার নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন ওরফে চরিত্রের জন্মান্তর। 'চতুরঙ্গ' একটি শচীশের কাহিনি নয়, নানা শচীশের কাহিনি। শচীশের অনেক জন্ম অনেক মৃত্যু ঘটেছে। শচীশ জীবনের একটি ছক আশ্রয় করেছে। অনতিবিলম্বেই তাকে

পরিত্যাগ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। দামিনীও তা-ই করেছে। বাংলা উপন্যাসে এ দুই চরিত্র প্রথম আধুনিক চরিত্র—

> 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রবক্তা শ্রীবিলাস জানিয়েছেন, এ দুই চরিত্রের অভিনয় আত্মগত। বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম চরিত্র আত্মানুসন্ধানে, আত্মসমীক্ষায় ব্যাপৃত হল। নিজের মুখোমুখি হল। বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, বহির্জগৎ থেকে ভিতর-দেহলিতে প্রত্যাবর্তনের প্রথম শিল্পরূপ চতুরঙ্গ।[২]

স্বীকার্য, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা তথা ভারতীয় উপন্যাসে নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন রবীন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে ইংরেজি-ফরাসী উপন্যাসে একই সময়ে নতুন রীতি প্রবর্তিত হয়। মার্সেল প্রুস্তের ফরাসী উপন্যাস 'Du Cote de chez Swann' (১৯১৩), ইংরেজি ভাষায় ডরোথি রিচার্ডসনের 'Pilgrimage' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড (১৯১৫), জেমস জয়েসের 'A Portrait of the Artist as a Young Man' (১৯১৬) এসময়ে প্রকাশিত হয়। তখনই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)। ইংরেজি উপন্যাসে এই নূতন রীতির লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে এডোয়ার্ড অ্যালবার্ট লিখেছেন, তা প্রাকসমর-পর্বের হেনরি জেমস-এর উপন্যাস থেকে ভিন্নতর—

> প্রাক্‌নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত নিটোল সংহত কাহিনীর জায়গায় এলো আপাত শিথিল কিছুটা তরল ও সংহতি-বিহীন প্রবহমান দৃশ্যের অন্তরালে শিল্পসচেতন জীবনবীক্ষা। বহির্জীবনের বিক্ষোভ ও সংঘাত জড়িয়ে জীবনের অন্তঃবাস্তবতার সন্ধানে ঔপন্যাসিক তৎপর হয়ে ওঠেন, সন্ধান করেন অন্তঃসঙ্গতির ফল্গুধারা। বাহিরের ফর্মহীনতার আড়ালে বহে চলে চেতনা প্রবাহ। ব্যবহৃত হয় অন্তঃসংলাপ, ভাববিভঙ্গের বিচিত্র রূপ, প্রতীক আর অসাধারণ চিত্রকল্প। ঔপন্যাসিক যেন সৃষ্ট মনের ভিতর থেকে জগৎ ও জীবনকে দেখতে চান। সময়ের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত কখনো-বা থেমে যায়, মনে হয় পরিচিত দেশকাল পরিবেশের সীমা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে; প্রথাসিদ্ধ প্লটের জায়গায় দেখা যায় আপাত-অসংলগ্ন দৃশ্যনিচয়।[৩]

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে এইসব লক্ষণ নির্ভুলভাবে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকে উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ রীতিকে ভেঙেছেন। প্রাক্ 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্র-উপন্যাসে বঙ্কিমী উপন্যাসের পরিকাঠামো বজায় ছিল, এখানে তা সম্পূর্ণ বর্জিত। এ উপন্যাসের কোনো স্পষ্ট পরিণতি নেই, নিটোল উপসংহার নেই, প্রথাসিদ্ধ আদি-মধ্য-অন্ত্য নেই, কাহিনি-সূচনায় চরিত্র সমূহের উপস্থাপনা নেই, কাহিনি-ক্রম ও পরম্পরা নেই। স্বীকার্য, উপন্যাস পাঠকের অভ্যস্ত সংস্কারকে রবীন্দ্রনাথ নিপুণ হাতের অভ্রান্ত আঘাতে চূর্ণ করে দিয়েছেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটিকে লেখক আপাত-শিথিল সংহতিবিহীন দৃশ্য-নিচয়ে উপস্থিত করেছেন। চরিত্র—চরিত্রই তাঁর একমাত্র অম্বিষ্ট। ফলকথা, 'চতুরঙ্গ' একটি সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন তিনটি আয়ুধ অবচেতন, প্রতীক ও সংলাপ। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের সংলাপে বিশেষ জোর পড়েছে। প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত চলতি ভাষা-আন্দোলনের শরিক হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস লিখেছিলেন—এই অভিমত অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। 'চতুরঙ্গ'-এর ভাষা ঠিক চলতি ভাষা নয়, সাধু ভাষাও নয় তার চেয়ে কিছু বেশি। এই সংলাপ প্রধান উপন্যাসে বিবরণাত্মক গদ্য-ন্যারোটিভ প্রোজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এখানে সমাজ গৌণ, বস্তুপরিবেশ গৌণ, বাহির জীবনের ক্রিয়াকলাপ গৌণ। নায়ক-নায়িকা আত্মমগ্ন, অন্তর্লোকের গভীর থেকে গভীরে তাদের যাত্রা। বাহিরের বস্তুজগৎ ও পাঠক সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কোনো বাসনা তাদের নেই। সে দায়িত্ব পালন করেছে

তাদের বন্ধু শ্রীবিলাস, যে উপন্যাসের প্রবক্তা। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা আত্মসন্ধানের পটরূপে সমাজ এখানে নেই। ব্যক্তি ও সমাজের সংঘর্ষ ব্যাপারটাই এখানে গৌণ। তাহলে যে উপন্যাসে ব্যক্তি-চরিত্রের সর্বময় প্রতিষ্ঠা ও চরিত্রের নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন লেখকের লক্ষ্য, সেখানে চরিত্রের অন্বেষণ, আত্মসন্ধান ও অন্তর্দ্বন্দ্ব কীভাবে দেখানো যাবে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের সংলাপ অসাধারণ গুরুত্ব পায়। সংলাপ হয়ে ওঠে চরিত্রের প্রাণময়সত্তার উচ্চারণ, সংলাপের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় চরিত্রের পরিবর্তন—

> তাই সংলাপ প্রধান চতুরঙ্গ উপন্যাসে ভাষা খুব জরুরী হয়ে উঠেছে। এই সংলাপের সঙ্গে দৈনন্দিন বাস্তবজীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। শচীশ বস্তুলোককে আদৌ মান্য করে না, চতুরঙ্গের লেখকও উপন্যাসটির বাস্তবতা প্রতিষ্ঠায় আদৌ ব্যাকুল নন। আসলে চতুরঙ্গ অন্তঃবাস্তবতা বা Inner-reality উপন্যাস। সংলাপে তার পরিচয় পাই।[৪]

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আঙ্গিকগত নতুনত্বকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছে তার ভাষা। তীক্ষ্ণ তীব্র মর্মভেদী অনুভূতিগাঢ় ভাষারীতি এই উপন্যাসের ভাষায় এনেছে হীরকদ্যুতি। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে ভাষা চরিত্রের অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করেছে। অবচেতন মনে আলো-আঁধারের শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে এর ভাষা, তা অন্তর্গহনের রূপ থেকে রূপান্তরের সাক্ষ্যবাহী। ফলে ভাষা এখানে বিশ্লেষণধর্মী নয়, সংকেতধর্মী। শচীশের আত্মসন্ধান, দামিনীর অন্তরের কঠিন অন্তহীন দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুর পীড়ন, শ্রীবিলাসের বুদ্ধি-প্রবুদ্ধ জীবনজিজ্ঞাসা এই ভাষায় রূপায়িত। এই সংলাপ-প্রধান উপন্যাসে ভাষা চরিত্রের প্রাণময়সত্তার উচ্চারণ, একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তা তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন শিল্পীর আত্ম অভিজ্ঞতার সার্থক বাহন।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাস চরিত্র সমৃদ্ধ অন্তঃবাস্তবতার উপন্যাস। এদের অনুভূতি, চেতন ও অবচেতনলোকের ভাবনা, বহমান ভাবাবেগ ও স্মৃতি, অনুষঙ্গ জেগে-ওঠা নানা বিচূর্ণ ভাব প্রকাশের যোগ্য বাহন যে ভাষা তা বিশিষ্ট, প্রতীকী তাৎপর্যে অন্বিত, গভীর ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। এই উপন্যাসে চরিত্র স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেছে চেতন থেকে অবচেতনে, অবচেতন থেকে চেতনে। তাদের চেতনাস্রোতে অবচেতনস্রোতে ভেসে ওঠা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তসমূহের যোগ্য বাহন এই ভাষা। শচীশের পূর্ণতা-অন্বেষণ, দামিনীর তীব্র জীবনাসক্তি, শ্রীবিলাসের আত্মগোপনকারী ভূমিকা রূপায়িত হয়েছে এই ভাষায়। এই উপন্যাসে বাস্তবতার কোনো দাবি নেই। এখানে পরিবেশ গৌণ, সমাজের ভূমিকা অপ্রধান, বহির্জগতের ঘটনা তাৎপর্যহীন, চরিত্র সংখ্যা ন্যূন। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রের অন্তর্লোক। প্রধান দুই চরিত্র, শ্রীবিলাসের ভাষায় আত্মমগ্ন। বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের যোগ রক্ষা করে ভাষ্যকার শ্রীবিলাস।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারের এইসব বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের সমর্থনে উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। তা গ্রহণ ও বিচারের পূর্বে অবশ্য স্মর্তব্য, এই উপন্যাসে মাত্র একজনেরই দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত। সে হল শ্রীবিলাস যে কথক, দর্শক, ভাষ্যকার, প্রধান দুই পাত্র-পাত্রী থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত, কিন্তু সে নির্বিকার দর্শক মাত্র নয়, আত্মগোপনকারী এবং ধারাভাষ্যপ্রবাহে তার নিজ জীবনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, ব্যর্থতা ও সার্থকতা, ঔদার্য ও ঈর্ষা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের মানবিক প্রতিক্রিয়া গূঢ় রেখায় মুদ্রিত। উপন্যাসের ভাষারীতির গভীরতর পরিচয় গ্রহণের পূর্বে উপন্যাসে শ্রীবিলাসের ভূমিকা অবশ্য স্মর্তব্য। এই উপন্যাসে লেখক ভাষারীতিতে সর্বাত্মক পালাবদলের জন্য উন্মুখ।

তথাপি এই উপন্যাসের ভাষা সাধুরীতির কাঠামোকেই আশ্রয় করে আছে।

'চতুরঙ্গ'-এর ভাষারীতির উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কথকের (শ্রীবিলাসের) চেতনাবাহী স্মৃতি-অনুসঙ্গে বর্ণনা কখনো উজ্জ্বল, কখনো ঝাপসা, দৃশ্যপট ও বস্তুপরিসরের বিবরণ কখনো সামান্য উপস্থিত, কখনো অনুপস্থিত। বর্ণনা কখনো অসম্বন্ধ, কখনো ইশারামাত্র, মিতকথিত। যেমন—

১. গুহা হইতে ফেরার পর হইতে দামিনীকে আর বড়ো দেখা যায় না। সে আমাদের জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু পারতপক্ষে দেখা দেয় না। সে এখানকার পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, সমস্ত দিন তাদেরই মধ্যে এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়।

গুরুজি কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়। কিছুদিন যেমন সে দেবপূজার মতো করিয়া আমাদের সেবায় লাগিয়াছিল এখন তাহাতে ক্লান্তি দেখিতে পাই, ভুল হয়, কাজের মধ্যে তার সেই সহজ শ্রী আর দেখা যায় না।

এখানে দামিনীর জীবনযাত্রার তথ্য উপস্থিত, দৃশ্যপরিসর ও দৃশ্যপটের বস্তুগত বিবরণ অনুপস্থিত। এইসব বর্ণনাবাহী পংক্তি কথকের অন্ধকার চেতনায় ভাসমান। কখনো উজ্জ্বল, কখনো অনুজ্জ্বল। এখানে ভাবাবেগের চিত্রকল্প চেতনায় অনুজ্জ্বল।

২. এমন সময় শোনা গেল, চাঁটগাঁয়ের কাছে কোন এক জায়গায় শচীশ আমাদের শচীশ লীলানন্দস্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

এখানে দৃশ্যপট নিষ্প্রভ, ভৌগোলিক বিবরণ স্কেচধর্মী ও অস্পষ্ট, কিন্তু কথকের চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শচীশ-ব্যক্তি চরিত্রটি। 'শচীশ আমাদের শচীশ' অংশে জোর পড়েছে, কথকের চেতনায় তা দৃশ্যমান।

৩. এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল।...নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুই ধারে শিশুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের এক দিকের খানিকটা আছে। কিন্তু বাগান নাই। থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন-এক মুসলমান গোমস্তার গোর; তার ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিগুলির এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে; একেবারে ফুলে ভরা বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মুলিয়া দিয়া দক্ষিণা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে। দিঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে; তার তলায় ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিরা ছোলার চাষ করিয়াছে; আমি যখন সকালবেলায় শেলো-পড়া ইটের ঢিবিটার উপরে শিশুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধোনেফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

এই অংশে কথকের চেতনাবাহী স্মৃতি-অনুষঙ্গে ভেসে আসে বর্তমানে পরিত্যক্ত নীলকুঠির অতীত কালের জীবনের চিত্রমালা, সেইসঙ্গে মৃত দামিনীর উচ্ছল জীবনাসক্তির নানা ছবি। আবেগাপ্লুত কথকের মগজ ধোনেফুলের গন্ধে ভরে যায়। কথকের নিঃসঙ্গতা, বেদনা, অন্তররুদ্ধ হাহাকার, একাকিত্ব বয়ে আনে এইসব ছবি।

৪. স্বামী (লীলানন্দ) যখন থামিলেন সেই আকাশ-ভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল অনেকক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

শচীশের প্রতি দামিনীর আত্মনিবেদন এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রূপায়িত।

৫. দামিনী তখনই দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শচীশের একি চেহারা। প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া

ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা। চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কো-খুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।

শচীশের অন্তর্লোকের বিপন্নতা এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আভাসিত। ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজ দেখে যেমন দুর্যোগের ভয়াবহতা অনুমান করা যায় তেমনি বিধ্বস্ত অবয়ব শচীশকে দেখে তার অন্তর্লোকের বিপন্ন ইতিহাস অনুভব করা যায়। চরিত্রের শরীরী অভিব্যক্তি ও আচরণ নিয়ে এসেছে গূঢ়তর ব্যঞ্জনা।

৬. সেদিন শচীশ আর কীর্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণ হাওয়ায় দূরসমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল।

এখানে শচীশের মনোভাব সংকেতে ও সাংগীতিকায় ব্যঞ্জিত, উচ্চারিত। এর আড়ালে রয়েছে দামিনীর বঞ্চিত নারী জীবনের আর্তি আর অভিযোগ, যা শচীশকে প্রকৃতি, নিঃসঙ্গতা, শব্দ ও নৈঃশব্দ্যে একাত্ম করে দিয়েছে। ব্যঞ্জনায় বেদনাময় চিত্র-মাধ্যমে চরিত্রের নিঃসঙ্গতা ও বেদনা এখানে আভাসিত।

৭. সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো তার ভেজা নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল, সে যেন আদিকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু।...

অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তার গায়ে রোঁয়া নাই; কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?

এ সেই বিখ্যাত গুহাদৃশ্য। শচীশের ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত। অর্থাৎ শচীশের অবচেতনে ভাসমান চিত্রকল্পরাজি। শচীশের অন্তঃকথন (ইন্টিরিয়র মনোলোগ)।

গভীর রাতে অন্ধকার গুহায় দামিনীর আত্মসমর্পণের অভিঘাতে শচীশের অর্ধজাগ্রত চেতনায় জেগে ওঠে নানা প্রতীকীভাবনা। এখানে তারই চিত্রপুঞ্জ। প্রতীকী তাৎপর্যে অন্বিত। গুহার আঁধারে 'আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু'। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি যৌনপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। আঁধারে অবচেতনায় তাকে মেনে নিতে আপত্তি শচীশের মনের আপত্তির প্রতীক আঁধারে অর্ধজাগ্রত শচীশের লাথি মারায়। আর শেষ তিনটি সংহত অর্থময় বাক্যে তা ব্যঞ্জিত—অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না? এই তিনটি বাক্যে ব্যঞ্জিত হয় শচীশ-প্রত্যাখ্যাত দামিনীর নারীজীবনের ট্রাজেডি—তার বেদনা, তার সার্থকতালাভের ব্যর্থপ্রয়াস, প্রত্যাখ্যানে তার অসম্মান ও অসহায়তা। চেতন-অবচেতনের সীমান্তে অবস্থিত শচীশের মননচৈতন্যের চিত্রণে এই ভাষা লাভ করেছে বিরল শিল্পসাফল্য।

৮. চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত

একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

'না' সর্বাঙ্গীণ নেতিবাচক দৃশ্যপটের বর্ণনায় পূর্ববর্তী বাক্যের শেষে একবার 'না' শব্দটির ব্যবহার। পরবর্তী পরস্পরিত দীর্ঘবাক্যে ছয়বার 'না' শব্দের ব্যবহার। এখানে জোর পড়েছে নেতির উপর। দামিনী এখানে এক লোকে উপনীত, যেখানে সবকিছুই অস্বীকৃত। তারপরই আর-একটি অনুরূপ দীর্ঘবাক্য, যেখানে পরপর দুটি উপমাচিত্র মারফৎ সেই নেতিবাচকতাকে ব্যঞ্জিত করে তোলা হয়েছে। দামিনীর রিক্ত বঞ্চিত ব্যর্থ শূন্য জীবনের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে দেখা বিশ্ব, ফ্যাকাশে সাদাও সেই নেতিবাচকতারই প্রকাশ। দামিনী চলেছে অনিবার্য ব্যর্থতায়, 'না'-এর উপর দিয়ে তার ব্যর্থতার পরিণামের দিকে গতি। আবেগ, ভাবানুষঙ্গ আর সংকেত-মণ্ডিত এই শব্দচিত্র দামিনীর শূন্য পরিণতির ইঙ্গিতবহ প্রতীকীচিত্র।

৯. যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।

উপন্যাসের অন্তিম মুহূর্তের এই ছবিও প্রতীকী তাৎপর্যে অন্বিত। দামিনীর জীবনপিপাসার দুর্নিবার তীব্রতা আর প্রণয়াবেগের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার অচরিতার্থ শুষ্ক দাম্পত্য অধ্যায়। 'জীবনরসের রসিক' দামিনী একদা পণ করেছিল, উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না। আজ তাকেই অচরিতার্থতার বেদনা নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে। শচীশ তার আকাশ, তাকে দামিনী কোনোদিনই পাবে না, এই উপলব্ধি মেনে নিতে দামিনীর বুক ভেঙে যায়, তবু মেনে নিতে হয়, সে ফিরে আসে মর্ত্য পৃথিবীতে। এতদিনের সঙ্গী শ্রীবিলাসকে ভালো করে দেখে। পূর্ণ অসীম অসম্ভবকে না পেয়ে দামিনী পেতে চায় অপূর্ণকে, সীমাকে, সম্ভবকে। কিন্তু জীবনের পরম লগ্ন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তাই শ্রীবিলাসকে বিবাহ করেও তার পাওয়া হল না 'সাধ মিটিল না' দামিনী মৃত্যুমুহূর্তে পূর্ণতা প্রত্যাশী, সেই অচরিতার্থ প্রত্যাশার ব্যঞ্জনাময় চিত্র দামিনীর এই সংলাপ। 'চতুরঙ্গ'-এর ভাষারীতিতে উপন্যাসের অন্তরপ্রকৃতি প্রতিভাত হয়েছে। এদিক থেকেও এই ভাষারীতি বিচার্য—

> কেবল আয়তনগত ক্ষুদ্রতার জন্যই নয়, আন্তর লক্ষণ বিচারে চতুরঙ্গের নির্মাণরীতিতে সংক্ষিপ্ত ও সংহতি-ধর্ম সুপ্রকাশ।...আবেগের অতিরেক ও ফেলিলতা বর্জন করে ভাষার সংক্ষিপ্ত ও সংহতি-সাধনে লেখক সচেতনভাবে সচেষ্ট।[৫]

এই বক্তব্যের সমর্থনে বিজ্ঞ সমালোচক যে উদাহরণ দিয়েছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'সবুজপত্র'-র পাঠে 'শচীশ'-অংশের ৪-সংখ্যক পরিচ্ছেদে 'আজ মনে হইল শচীশ নেশা করিয়াছে' এই অংশের পরে ছিল—"সকাল বেলাকার শুকতারার মত তার যে দুটি চোখ হইতে জাগরণের আলো ঠিকরাইয়া পড়িত সেই চোখে আজ স্বপ্নের গোলাপী আভা, তার উপরে ছলছল বাষ্পের পর্দা।"[৬] অপ্রয়োজনীয় আবেগমুক্ত কাব্যময় ভাষা বর্জন করে বক্তব্যকে সংহত করার জন্যই এই অংশটি উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে বর্জিত হয়েছে। কিন্তু এই বর্জনের অর্থ এই নয় যে 'চতুরঙ্গ' লেখক বাক্‌রীতিতে কাব্যধর্মের বিরোধী। আসলে এই কাব্যময়তা উপন্যাসটির বিষয়-বিন্যাসের সঙ্গে একাত্ম।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ভাষারীতি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত ভাষা। প্রাত্যহিক জীবনের মালিন্য-মুক্ত ভাষা, তা গূঢ় ব্যঞ্জনাশক্তিসমৃদ্ধ ও সংকেতবাহী। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ভাব-পরিমণ্ডল ভরে আছে পূর্ণতার অন্বেষণে ব্যাকুল শচীশ আর জীবনের সার্থকতা অন্বেষণে অস্থির দামিনীর

আর্তিতে। 'চতুরঙ্গ'-এর ভাষা হয়ে উঠেছে তার উপযুক্ত মাধ্যম। চিত্রকল্পধর্মী সংকেতবাহী ভাষার মাধ্যমে লেখক প্রকাশ করেছেন শচীশ ও দামিনী নামক দুই অসামান্য পাত্রপাত্রীর মনের রুদ্ধ কামনা, অস্থির চিত্তবিক্ষোভ, হৃদয়ের তীব্র আর্তি; আরো প্রকাশ করেছেন পাত্র-পাত্রীর মনের অবচেতন স্তরের নানা রহস্য। স্মর্তব্য, জীবনের অন্তঃবাস্তবতার রহস্যময় অন্বেষণকে প্রকাশের মাধ্যম যে ভাষা, তা কাব্যময় ও রহস্যময়। কয়েকটি উদাহরণে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়—

১. সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো; সে যেন আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু।

   এখানে উপমার ব্যবহার বিশেষত্বপূর্ণ। অবচেতনের অনুভূতিকে করে তুলেছে শরীরী। এখানে সাবয়ব থেকে নিরবয়বে, নিরবয়ব থেকে সাবয়বে অনায়াস যাত্রা।

২. চারিদিকে ধু ধু করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলিও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

   এখানে নিসর্গদৃশ্য পেয়েছে গূঢ় তাৎপর্য, তা এসেছে নিসর্গের উপর প্রাণীস্বভাব আরোপের ফলে। সমস্তটা মিলিয়ে সংকেতবাহী। বস্তুসংস্থান ও মনোভাবের অন্তর্বয়নে বর্ণনাংশ পেয়েছে লোকোত্তর পরিব্যাপ্তি।

৩. স্পষ্ট দেখিতেছি, শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

   শচীশ চরিত্রের ও তার সাধনার অসামান্যতা এখানে গূঢ় রূপকার্থ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

৪. যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মণ্ড একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

   উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের নিপুণ ব্যবহারসমৃদ্ধ এই চিত্র সাংকেতিক তাৎপর্যবাহী। নিষ্ঠুর নিসর্গ চিত্রে দামিনীর নৈরাশ্য ব্যঞ্জিত হয়েছে।

৫. সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না।

উৎপ্রেক্ষা, উপমা-যোগে আর একটি নিসর্গচিত্র সাংকেতিক তাৎপর্যে অন্বিত হয়ে উঠেছে। স্বীকার্য, এইসব চিত্রকল্পের অন্তর্নিহিত সাংকেতিক ব্যঞ্জনাশক্তি পাত্র-পাত্রীর মনের অবচেতনের নানা রহস্যময় দিকের আভাস এনেছে। এখানেই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে ভাষারীতির বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর একটি বিষয়ও এখানে স্মর্তব্য। 'চতুরঙ্গ'-এর বাইরের সাধুভাষা-রূপের অন্তরালে স্পন্দিত হয়েছে চলিতরীতির প্রাণধর্ম। তার পরিচয়স্থল সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, ইডিয়মের প্রয়োগে। যেমন—

১. সমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সীমিত করা অথবা লুপ্ত করা : 'পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত', 'যেখানে তার আবদার সেখানেই তার জোর', 'শচীশের একি চেহারা', 'চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কো-খুসকো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা'।

২. চলিত সর্বনাম পদের বহুল ব্যবহার: তা, তাকে, তার, যাতে ইত্যাদি।

৩. সাধুভাষার সঙ্গে ইডিয়ম-ধর্মী কথাশব্দ বা চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার : 'ফসকরিয়া', 'পা-টেপানো', 'তামাক-সাজানো', 'পেটমোটা পুরুত পাণ্ডা', 'ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা', 'বেরো', 'গেছে'।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে লেখক ভাষাকে নানা কাজে ব্যবহার করেছেন। এ ভাষায় স্পন্দিত হয়েছে প্রাণধর্ম, চেতন ও অবচেতনের নানা গূঢ় ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনাধর্মী, সংকেতবাহী, অন্তঃবাস্তবতার প্রতীকধর্মী বাহনরূপে ভাষার ব্যবহার হয়েছে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের উজ্জ্বল মার্জিত প্রসাধিত ভাষার দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে চরিত্র। এ উপন্যাসের সর্বাঙ্গীণ আধুনিকতার যোগ্য বাহন হয়ে উঠেছে এই ভাষারীতি।

উৎসের সন্ধানে

১. পুলিনবিহারী সেন সংকলিত তথ্যপঞ্জি : প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'-এর পরিশিষ্ট, প্রকাশ ১৯৫৭, পৃ. ৪৫
২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৪, পৃ. ৪৮৫
৩. তদেব : পৃ. ৭-৮
৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র উপন্যাসের ভাষা', জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাকা) বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা 'কাব্য সাহিত্য পত্র'র চতুর্দশ সংখ্যায় (১৩৯৩) মুদ্রিত।
৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : 'রবীন্দ্র-উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প', প্রতিভাস পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৯, পৃ. ২২৪
৬. তদেব : পৃ. ২২৪